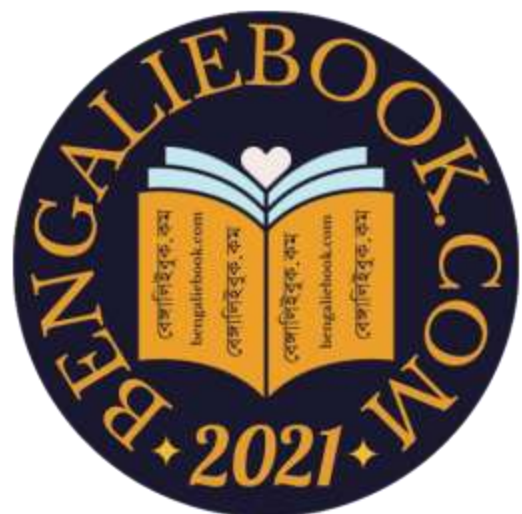


অজ্ঞাত রচনা

দুটি অসমাপ্ত প্রবন্ধ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



দুটি অসমাপ্ত প্রবন্ধ

এক

দেশকে স্বাধীন করার প্রয়াস ‘ন্যারো ন্যাশনালিজম্’ ও নয়; ‘চাউভিনিজম্’ ও নয়; বিশ্বমানবের হিতের জন্যই নিজের দেশ। যে দেশে জন্মেছি, মানুষ হয়েছি, সে দেশকে পরা-অধীনতার নিদারুণ অভিশাপ থেকে মুক্ত কোরব।

আদর্শের উল্লেখ যখন কোরব তখনই বৃহৎ আদর্শ, কল্যাণের আদর্শ গৌরবের আদর্শের কথাই স্মরণ কোরব। কেবল মহামানবতার আদর্শ গ্রহণ কর, তাকে ভারতের আদর্শ, এশিয়ার আদর্শ, হিন্দুর আদর্শ—এদিক দিয়ে কিছুতেই বিচার কোরব না। কারণ সেই ত ক্ষুদ্র মনের সঙ্কীর্ণ হীন আদর্শ; কোনমতেই সর্বজনীন মুক্ত আদর্শ নয়।

ত্যাগ কিসের? ভোগ করবে কে? কিসের জন্য জীবনের সর্বস্ব পরিত্যাগব্রতী হব? যারা বৃহত্তর স্বার্থের জন্য সামান্য বিশিষ্ট স্বার্থ ত্যাগ করতে পারবে না—শুধু তাদের জন্য? এ যেমন আত্ম-বিড়ম্বিত কৃপণের ধন সঞ্চয়ের মত, আমি না খেয়ে না পরে না দিয়ে খেটে খেটে মরি, আমার নন্দদুলাল ছেলেটা যেন সমস্ত নিষ্ফল জীবনটা নির্বিঘ্নে বেঁচে থাকতে পারে—এরই জন্য?

হে ভারত, তুমি কি শিখায়েছ না, ধর্মযুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে! তাই ভারতের আজ এত বড় দুর্দশা। রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড় ঈশ্বর-বিশ্বাসী জগতে কেউ আছেন বলে আমার মনে হয় না। এই পরম ভাগবত কবির সহস্র পলিটিক্যাল যুক্তি-তর্ক ভগবানের রুদ্ধদ্বারে এসে আছাড় খেয়ে পড়ে। তাঁর একান্ত বিশ্বাস বিধাতার কল্যাণহস্তই সব কিছু

করে চলেছে, কিন্তু তাঁর ইচ্ছা কি তা আমরা জানিনে, তাঁর ইচ্ছার দোহাই পলিটিক্স-এ আসা কোন কারণেই আমার ভালো মনে হয় না।

প্রাচীনকালের দর্শনের বড় বড় যুক্তি-তর্ক যেমন বেদের বাণীর দরজায় এসে নিজেদের পথ হারিয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হতো।

বড় বড় ঈশ্বর-বিশ্বাসী ভক্তের দলই এ যাবৎ দেশের পলিটিক্স নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। যাঁদের হওয়া উচিত ছিল সন্ন্যাসী, তাঁরা হলেন পলিটিশিয়ান। তাই ভারত পলিটিক্সে এত বড় দুর্গত।

দুই

সংসারে যাহার যথার্থ মর্মটি উদঘাটন করা যত দুরূহ, মিথ্যায় বিড়ম্বিত করিয়া তোলা তাহাকে তত সহজসাধ্য।

সুবিস্তীর্ণ বারিধির কূল-কিনারা মানুষের চোখের উপর থাকিতে পায় না বলিয়াই উপরের মেঘ ও আকাশ এমন করিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহাকে সব দিকে মিথ্যায় সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলিবার সুযোগ পায়।

ভগবান ব্যাপারটির প্রতি চাহিয়া দেখ। ইহার সত্য তত্ত্বটি আবিষ্কার করা নাকি একান্ত কঠিন, তাই কুতৃত্বে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলা এত সহজ। অজ্ঞানী-জ্ঞানী, বোকা-বুদ্ধিমান সকলেরই যেন বলিবার বিষয় ইহাতে কিছু-না-কিছু থাকেই। আবার সবচেয়ে কৌতুক এই যে, ইহাতে জ্ঞানীর চেয়ে অজ্ঞানীর, বুদ্ধিমানের চেয়ে বোকার হাতটাই বেশি খেলে। ইহাদের নৈপুণ্যই যেন সকলের উপর ফেনাইয়া উঠিতে থাকে। কিন্তু, তাই বলিয়া অকৌতুকও বড় কম নাই। কারণ, ফেনা জিনিসটি চিরস্থায়ী হইয়া রহে না। সুতরাং আনাড়ীর সুবিধাটা শুধুই ততক্ষণ, যতক্ষণ এই ফেনাটা বাঁচিয়া থাকে; যতক্ষণ ভাসমান বুদ্ধদপুঞ্জ আসল বস্তুটি আবৃত করিয়া রাখার উপায় থাকে। এই বুদ্ধদ সমষ্টি কোন গতিকে মরিয়া গেলে আর রক্ষা নাই। তখন অসত্যের যে চেহারা বাহির হইয়া পড়ে তাহা অতি

কদর্য, অতি ভয়ানক। এ ছাড়াও একটা নিদারুণ অসুবিধা এই যে, এই সকল অগাধ, অতি বৃহৎ ব্যাপারের সাঁচ্চা ও বুটার হিসাব ঠিক এই অনুপাতেই গণনা করা হয়। সুতরাং সে অক্ষফলে আকাশ-পাতাল ব্যবধান থাকেই। একটা উদাহরণ দিয়া বলি। রাঙা কিনিতে গিয়া ঠকিয়া সীসা কিনিয়া আনিলে ক্ষতি হয়ত হয়, কিন্তু ভরাডুবি হয় না, কিন্তু হীরা কিনিতে গিয়া ঠকিয়া আসিলে যে বস্তুটা ঘরে আসে সেটা কাঁচ মাত্র। একেবারে ফেলিয়া দিতে হয়। সাহিত্যও ঠিক তাই। অপরিসীম ব্যাপার, অগাধ ব্যাপ্তি। সুতরাং ইহারও সাঁচ্চায়-বুটায় আকাশ পাতাল প্রভেদ। অথচ, উপরোক্ত কারণে কাহাকেই হাত খেলাইতে নিষেধ করিবার জো নাই। মানুষ যাই আপনাকে বুঝিয়া ফেলে সে অতি-বুদ্ধিমান, যেহেতু, সাংসারিক ছোট বিষয়ে, অর্থাৎ যাহার উভয় তট মানব-চক্ষুর অন্তর্গত, যাহা সুনির্দিষ্ট, যাহাতে হাত দিবামাত্রই পৃথিবীর নির্বোধ লোকগুলোর সহিত অনধিকারচর্চা বাবদে খ্যাচাখিচি বাধে, বেরসিক লোকগুলো তাহাদের একেজো জগতের বৃহত্তম তোরণের বহির্দেশে অসম্মমে বিদায় করিয়া দেয়, অমনি বাহিরে আসিয়াই বুদ্ধিমান টের পায় এ জীবনের লক্ষ্য কি! লক্ষ্য সাহিত্য সৃষ্টি করা। শুদ্ধমাত্র এই জন্যই তাঁহার ধরাধামে আগমন। অতএব, আর কালবিলম্ব না করিয়া, অমূল্য সময় অপব্যয় না করিয়া এক পা ছোটগল্প ও আর এক পা খণ্ডকবিতার মাথায় গিয়া হৈহৈ শব্দে কর্তব্যপথে আগুয়ান হইয়া পড়ে।

এ পথের সুবিধা-অসুবিধার কথাটা পূর্বেই বলিয়াছি, সুতরাং পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই। কিন্তু, ফলাফলের কথাটা, অর্থাৎ সেই হীরক ও কাঁচখণ্ডের উপমাটা আর একবার স্মরণ করাইয়া দিয়া আসল কথাটা বলিয়া যাই।

কিন্তু, পূর্বাভাসেই একটা অবান্তর কথার আবশ্যক। আজকাল কোন একটা মাসিকপত্র খুলিলেই চোখে পড়ে ছাপার অক্ষরগুলোকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করে হইয়াছে। একভাগ ছন্দোবদ্ধ ব্যাপার, অর্থাৎ—পদ্য [যাঁহারা লেখেন তাঁহাদের ভাষায় ‘কবিতা’!] আর এক ভাগ—যাহাতে ছন্দের বালাই নাই—অর্থাৎ কিনা গদ্য! পদ্যের আলোচনা পরেই হইবে, আগে গদ্যের কথাটাই বলি। এই গদ্য দুই শ্রেণীর। মাসিকের সম্পাদকেরা বলেন,

‘কথাসাহিত্য’ ও ‘গবেষণামূলক প্রবন্ধ’! এই ‘কথাসাহিত্য’ আবার তিন প্রকার। প্রথম ছোটগল্প, দ্বিতীয় ‘ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাস’ এবং তৃতীয়—যাহাকে সাহিত্যিকেরা কহেন—‘বিদেশের রত্নরাজি আহরণপূর্বক ভাষাজননীর শ্রীপদপঙ্কজে উপহার।’ উপহার! উপহারের দাম কষিতে গেলে লোকে আমাকে ইতর বলিবে, সুতরাং সেটা থাক। বাকী রহিল ছোটগল্প ও ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাস। কিন্তু, ইহাই বিশেষ করিয়া নাকি এ প্রবন্ধের আলোচ্য বস্তু, তাই শেষে বলিব।

গবেষণামূলক প্রবন্ধ! ইহাতে সাধারণতঃ কি বুঝায়, এ প্রশ্ন আর কোন দেশের লোক করিয়া বসিলে নিশ্চয়ই বিপদে পড়িতাম এবং খুব সম্ভব জবাব দিতেও পারিতাম না, কিন্তু, বাঙ্গালা মুলুকের লোকের কাছে ভয় পাইবার কিছুমাত্র হেতু দেখি না। কারণ, এ মুলুকের গবেষণার ধারা আমি বিদিত আছি। ইহা মাত্র দুই প্রকার এবং গবেষণাকারীরা দুই দল হইয়া বিরাজ করেন। এ দলের একজন যাই ‘পদ্যপ্রচারিণী’তে গবেষণা করেন, ‘বিক্রমপুর পরগণার স্বর্ণভৃগু গ্রামের তিষ্ঠিড়ী বৃক্ষমূলে যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাই ভোজরাজের তাম্রশাসন এবং ইহাই বাঙ্গালার ইতিহাসের প্রকৃত উপাদান।’ ‘গদ্যপ্রচারিণী’তে ও-দলের আর একজন তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করেন—‘কখনই না। কারণ, এই প্রমাণ—ওই প্রমাণ—সেই প্রমাণের বলে স্পষ্ট জানা যাইতেছে, ওটা ভোজরাজের তাম্রশাসন হইতেই পারে না, ওইটাই তাম্ররাজের ভোজশাসন, যাহা নবম ধর্মপালদেব পঞ্চম বিক্রমপালদেবকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া উজ্জয়িনীর তটে—উৎকীর্ণ করিয়া তাম্রলিপ্ত নগরে প্রোথিত করিয়াছিলেন, অতএব ইহাই বাঙ্গালার আসল ইতিহাস।’

দ্বিতীয় প্রকার হইতেছে, প্রাচীন কবিদিগের কাল নিরূপণ করা। একজন বলিতেছেন, কবি কালিদাসের প্রকটকাল ৫৬৮ শকে, আর একজন সংশয় প্রকাশ করিয়া জবাব দিতেছেন—শ্রদ্ধেয় লেখকের গণনায় ঈষৎ ভুল হইয়াছে। কারণ, অনঙ্গদেবের প্রপিতামহ তখন মগধের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সুতরাং এক পুরুষে যদি ২৫ বৎসর ধরা যায়, তাহা হইলে কালিদাসের জন্মকাল ১১৯৩ সংবতের পূর্বে ঘটিতেই পারে না।

এখানে হতভাগ্য পাঠক-পাঠিকার অবস্থা সহজেই অনুমেয়। আত্মরক্ষা অতি শ্রেষ্ঠ ধর্ম, এবং এ অধিকার সকলেরই আছে। কাজেই, পাঠকবেচারা যদি প্রাণের দায়ে গবেষণার হাত ছিনাইয়া কথাসাহিত্যের ভিতরে গিয়া ঢোকে তাহাকে নিন্দা করা চলে না। অবশ্য, এই যাওয়াটাকে ইংরাজি ভাষায় ‘ফ্রাইং প্যান টু দি ফায়ার’ বলিয়া পরিহাস করা চলে কিনা, ঠিক জানি না, কিন্তু আর কোন নিরাপদ স্থানের সংবাদও ত তাহাকে বলিয়া দিতে পারিলাম না।

এ হেন যে ‘গবেষণামূলক’ তাহা যে কি বস্তু আশা করি সাধারণকে তাহা বুঝাইতে পারিয়াছি। অন্ততঃ আমি ত শপথ করিতে পারি, বাঙ্গালা গবেষণাময় প্রবন্ধে ইহার অধিক কিছু এখনও আবিষ্কার করিতে সক্ষম হই নাই। কেহ হইয়া থাকিলে দয়া করিয়া লিখিয়া জানাইবেন, আজীবন কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিব।

এইবার ‘কথাসাহিত্যের’ কথা। দুনিয়ায় গান গাহিতে পারে না এমন লোক বিরল, কথাসাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারে না এমন হতভাগা ত নাই-ই। কারণ, কথার ত অন্ত নাই। থাকিলে, আজ পর্যন্ত এত মানুষ এত কথা লিখিয়া ফেলিয়াছে, কোন্ যুগে ইহার শেষ হইয়া যাইত। সে ত হইবার নয়। যাহার আদি অন্ত নাই তাহার অতীতও নাই ভবিষ্যৎও নাই। যাহা ঘটিয়া গিয়াছে তাহাও গত নয়, যাহা ঘটে নাই তাহাও অনাগত নয়। সৃষ্টি করার পক্ষে ইহাই ইহার প্রচণ্ড সুবিধা। মানুষের অদৃষ্ট ত দেখা যায় না, সে কি করিবে না করিবে, কি হইবে না হইবে, কোথায় জীবনের কূল-কিনারা সে ত কাহারও ঠাহর করিবার জো নাই, তাই নবীন সাহিত্যস্রষ্টা যখন দিকচক্রবালে আঙুল তুলিয়া জোর করিয়া বলেন, ওর বেশি নাই, তখনও চুপ করিয়া থাকিতে হয়, এবং ভারুক কবি যখন অপার আকাশে মুখ তুলিয়া মানবসৃষ্টির অগোচর বহু বহু দূরে ইঙ্গিত করিয়া হৃদয়ে অসীমতার আভাস জাগাইয়া দেন তখনও নির্বাক স্তব্ধ হইয়া থাকিতে হয়। হয় বটে, কিন্তু চুপ করিয়া যাওয়া এবং স্তব্ধ হইয়া থাকা এক বস্তু নয়। তাহাই বলিতেছি...।